৩. রাজপুত নীতি

(ক) প্রেক্ষাপট : রাজপুতদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন ভারতে মোগল শাসনের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আকবরের শাসনকালেই এই নীতি পূর্ণতা লাভ করে। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম মুসলমান শাসক যিনি রাজপুতদের সঙ্গে সংঘাতের স্থলে সমঝোতাকেই প্রাধান্য দেন। তুর্কি শাসনকালে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির সম্পর্ক নানান বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। বস্তুত দিল্লির সুলতানগণ স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল রাজপুত, তিনটি দাবি করত আনুগত্য প্রদর্শন, প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য ও পেশকাশ বা রাজস্ব প্রদান। আলাউদ্দিন খলজী ছিলেন প্রথম সুলতান যিনি দেবগিরির যাদবরাজ রামচন্দ্রদেবের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই সম্পর্ক শুধু সুলতান কর্তৃক যাদবরাজের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া নয়। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা স্থাপন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বহলুল ও সিকন্দর লোদীও

দোয়াবের রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ভারতে মোগলদের আগমনের পরেও আফগান ও হিন্দুরাজাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

মোগল সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে হুমায়ুনও স্থানীয় শাসক বা জমিদারদের সঙ্গে সমঝোতা করতে আগ্রহী ছিলেন। সেইমতো মেওয়াটী শাসকদের সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক শেখ ফকরউদ্দিন ভাক্কারির রচনার উল্লেখ করে সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন, ইরানের সুলতান শাহ তাহ্‌মাস্প হুমায়ুনকে রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার পরামর্শ দেন। কারণ জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে 'হিন্দ'-এ শাসন করা সম্ভব নয়। ভাক্কারির রচনা থেকেই জানা যায়, মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুন আকবরকেও একই পরামর্শ দিয়ে যান যে রাজপুতদের কাছ থেকেই একমাত্র আনুগত্য ও সেবা অর্জন সম্ভব।

(খ) প্রভাব : সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রখর দূরদৃষ্টি আকবরের রাজপুতনীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। *প্রথমত,* তুর্কো-আফগান মুসলমানগণ মোগলদের বহিরাগত বলে মনে করত। ভারত থেকে হুমায়ুনের বিতাড়নের ঘটনায় আকবর নিশ্চিত হন যে ভারতস্থিত মুসলমানদের ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। *দ্বিতীয়ত,* বাবর ও হুমায়ুনের সঙ্গে আগত সুদক্ষ সেনাপতি ও যোদ্ধার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তাদের কেউ কেউ স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠে। আফগানিস্তান থেকে নতুন সৈনিক আমদানি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানে আকবর-বিরোধী মির্জা মহম্মদ হাকিমের উপস্থিতি সেদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। *তৃতীয়ত,* রাজপুতদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দিল্লির সুলতানগণ আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুত রাজপুত বিরোধিতা সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। *চতুর্থত,* সতীশ চন্দ্র যার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, মোগলরা জমিদারদের অর্থাৎ স্থানীয় শাসকশ্রেণিকে খুশি করতে চেয়েছিল। আনুগত্য ও সেবার ক্ষেত্রে রাজপুতদের সুনাম সম্পর্কে আকবর সচেতন ছিলেন এবং এটিই তাঁর রাজপুত নীতি নির্ধারণের প্রাথমিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সদ্য প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও উজ্জীবিত করে তুলতে হলে রাজপুতদের সঙ্গে বৈরিতা পরিহার করে মৈত্রী গড়ে তোলাই কাম্য বলে তিনি মনে করেন। *পঞ্চমত,* ১৫৫৭ খ্রি.-এর এক ঘটনায় আকবরের হাতিটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাঁর সহগামীগণ পালিয়ে গেলেও অম্বররাজ ভারা মল কিছু সংখ্যক রাজপুতের সাহায্যে বাদশাহকে রক্ষা করেন। সিংহাসনে আরোহণের স্বল্পকালের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আকবরের মনে রাজপুতদের সম্পর্কে এক সম্ভ্রমের মনোভাব সৃষ্টি করে।

(গ) নীতির রূপায়ণ : রাজপুত নীতির ক্ষেত্রে আকবর কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। একটি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক আনুগত্যের অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হত। ফলে দুটি রাজপরিবারের মধ্যে বিবাহ একটি ব্যক্তিগত স্তরের বন্ধন ছাড়াও বশ্যতাস্বীকারের প্রতীক হিসাবে প্রতিপন্ন হত। খ্রি. চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে সুলতানি যুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত আছে। সূর বংশীয় আফগানরাও এই ধরনের বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অম্বররাজ ভারা মল তাঁর কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দেওয়ার পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে মেওয়াট অধিপতি হাজি খান পাঠানের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

আকবরও রাজপুত বিবাহের পূর্বে রোহিলা পরিবারে বিবাহ করেছিলেন। অম্বর, বিকানীর, জয়সলমীর, যোধপুর প্রভৃতি রাজপুত রাজপরিবারে সঙ্গে আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজপুত মৈত্রী স্থাপনের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক কখনই বাধ্যতামূলক ছিল না। রনথম্ভোরের হাড়া পরিবার তাদের কোনো কন্যাকে মোগল পরিবারে বিবাহ না দিলেও, সুর্জন হাড়া দুহাজারি মনসবদারের পদ লাভ করেন। সিরোহী ও বনসওয়ারার শাসকগণও কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াই আকবরের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এমন রাজন্যবর্গ মোগল রাষ্ট্রে 'বিশিষ্ট' ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতেন।

দ্বিতীয়ত, আকবর রাজপুত রাজাদের মোগল প্রশাসনে দায়িত্বশীল পদগ্রহণের আহ্বান জানান। অম্বররাজ ভারা মল, তাঁর পুত্র ভগবন্ত দাস ও পৌত্র মান সিংহ, সকলেই উচ্চরাজপদে আসীন হন ও আকবরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে কাজ করে যান। ১৫৭২ খ্রি.-এ আকবরের গুজরাত অভিযানের সময় ভারা মলকে আগ্রায় মোগল রাজপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সম্মান এতদিন শুধুমাত্র বাদশাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই দেওয়া হত। ভগবন্ত দাস ও মান সিংহ যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও সাত হাজারি মনসবদারের পদ লাভ করেন। লাহোর, কাবুল, আগ্রা ও আজমীড়ে যুগ্ম শাসনকর্তা হিসাবে রাজপুতদের নিযুক্ত করা হয়। কাবুল ও লাহোরের মতো সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের দায়িত্ব মান সিংহ ও ভগবন্ত দাসকে দেওয়া হয়। মান সিংহ পরে বাংলা ও বিহারের শাসক নিযুক্ত হন। ১৫৯০-৯১ খ্রি.-এ বিকানীরের রাই সিংহ লাহোর ও তাঁর পুত্র সুরজ সিংহ গুজরাতের শাসনকর্তার পদে আসীন হন।

তৃতীয়ত, মোগলদের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোনো রাজপুত রাজা তাঁর রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারতেন। মোগল আক্রমণের সম্ভাবনা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোগল নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকত। রাজপুত রাজারা তাঁদের রাজ্যে রাহ্‌দারি বা পথকর ধার্য করতে পারতেন না। এর উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম উপকূলের বন্দরের দিকে যাওয়া বাণিজ্যপথগুলিকে বণিকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা। মোগল জমি জরিপ ব্যবস্থা বা 'জাবৎ' রাজপুত রাজ্যগুলিতে প্রচলনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা 'রেখ' থাকায় এই চেষ্টা সফল হয়নি। রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে অঞ্চলগত বিবাদ দেখা দিলে মোগলদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। পোখারান পরগনার অধিকার নিয়ে জয়সলমীর, বিকানীর ও যোধপুরের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে আকবর তা যোধপুররাজ রাজা উদয় সিংহকে প্রদান করেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিলেও আকবরকে অনেক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। যোধপুররাজ রাও মালদেও-র মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত পুত্র চন্দ্রসেনের স্থলে আকবর জ্যেষ্ঠপুত্র রাও রামকে সিংহাসনে বসার অনুমতি দেন। তাঁর মৃত্যু হলে আকবরের হস্তক্ষেপে সিংহাসন লাভ করেন রাও রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা উদয়সিংহ। ১৫৯৩ খ্রি.-এ পান্নার রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরও উত্তরাধিকারী নির্বাচনে আকবরকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

চতুর্থত, রাজপুত মৈত্রীর কথা মনে রেখে হিন্দুদের ক্ষেত্রে আকবর কিছু উদারনীতি গ্রহণ করেন। কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটলে সেখানকার নারী ও শিশুদের দাসে পরিণত করা ও ইসলামে ধর্মান্তরিত করার রীতি তিনি নিষিদ্ধ করেন। কোটি কোটি টাকার তীর্থকর আদায় তিনি বন্ধ করে দেন। পরিশেষে ১৫৬৪ খ্রি.-এ জিজিয়া কর তিনি উচ্ছেদ করেন।

(ঘ) নীতির বিবর্তন : সতীশ চন্দ্র আকবরের রাজপুত নীতির বিবর্তনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়টি ১৫৭২ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী। এই পর্বে যে রাজপুত রাজন্যবর্গ আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাদের অনুগত মিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাদের নিজ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, দূরদেশে নয়, সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। সেই অনুসারে আকবরের উজবেক অভিযানে ভারা মল ও ভগবন্ত দাস বাদশাহের সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত থাকলেও যুদ্ধে অংশ নেননি। কিন্তু তোডরমল ও রাই পত্রদাস যুদ্ধে যোগ দেন। বাদশাহের শিবিরে উপস্থিত থাকলেও মান সিংহকে চিতোর অবরোধে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা ১৫৭২ খ্রি.-এ আকবরের গুজরাত অভিযানের সময় থেকে। এই পর্বে মান সিংহ শের খান ফুলাদির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইব্রাহিম হুসেন মির্জার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভগবন্ত দাসের পুত্র ভুপৎ রাই নিহত হন। শুধু অম্বরের কচ্ছওয়াগণ নয়, অন্যান্য রাজপুত রাজারাও আকবরের আদেশ পালন করেন। গুজরাত অভিযানের পূর্বে আকবর বিকানীরের রাই সিংহকে যোধপুর ও সিরোহীর দায়িত্ব দিয়ে যান। রনথম্ভোরের রাও সুর্জন হাড়া ও শেখাবতীর রাইসাল দরবারি গুজরাত অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

আকবরের রাজপুত নীতির এই পর্যায়েই মেবারের রানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৫৬৮ খ্রি.-এ আকবর চিতোর দুর্গ অধিকার করলেও মেবারের অধিকাংশই উদয় সিংহের নিয়ন্ত্রণে ছিল ১৫৭২ খ্রি.-এ প্রতাপ সিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। আকবর মোগল সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য প্রকাশের প্রস্তাব দিয়ে প্রতাপ সিংহের কাছে দূত প্রেরণ করলে মেবাররাজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে প্রস্তাব নিয়ে ভগবন্ত দাস, মান সিংহ ও তোডরমলের দৌত্যও ব্যর্থ হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী রাজকীয় পোশাক পরিধানে ও পুত্র অমর সিংহকে মোগল দরবারে প্রেরণ করতেও প্রতাপ সিংহ রাজি ছিলেন। কিন্তু মোগল বাদশাহের সামনে উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল।

১৫৭৬ খ্রি.-এর গোড়ায় মান সিংহের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার মোগলসেনা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে রওনা হয়। মোগলবাহিনীকে খাদ্য ও পশুখাদ্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য চিতোর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস করে দেওয়া হয়। প্রতাপ সিংহের রাজধানী কুম্ভলগড়ের অদূরে হলদিঘাটে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। তিন হাজার রাজপুতসেনার সঙ্গে যোগ দেয় হাকিম খান সূরের আফগানবাহিনী। প্রথম দিকে মোগলসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু আকবর স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, এরকম একটি গুজব মোগলদের মনোবল ফিরিয়ে আনে। মেবারবাহিনী পরাস্ত হয়, রানা প্রতাপ সিংহ পলায়ন করেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজয় প্রতাপ সিংহকে হতোদ্যম করেনি। সম্মুখসমর এড়িয়ে তিনি দীর্ঘদিন মোগলদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। তবে রাজপুত রাজ্যগুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা ও মোগল রাজশক্তির কাছে মাথা নত না করার স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি। আকবরের বিচক্ষণতা ও কূটকৌশলে অধিকাংশ রাজপুত রাজ্যই মোগলদের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়। রাজপুত রাজ্যগুলিকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার প্রদান করে, অভিজাতবর্গকে প্রশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত করে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করে আকবর রাজপুতজাতির মন জয় করে নেন।

আকবর প্রতাপ সিংহের ওপর চাপ অব্যাহত রাখেন। মোগলসেনা দুঙ্গারপুর, বনসওয়ারা ও সিরোহীর মতো মেবারের মিত্ররাজ্যগুলি দখল করে নেয়। কুম্ভলগড় ও উদয়পুরও মোগলরা দখল করে। ভীল উপজাতির সাহায্যে রানা প্রতাপ পার্বত্য অঞ্চল থেকে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৫৭৯ খ্রি.-এ বাংলা ও বিহারের মোগলবিরোধী বিদ্রোহ এবং বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিমের পাঞ্জাব আক্রমণের সম্ভাবনায় আকবর অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৫৮৫ খ্রি.-এ আকবর লাহোরে চলে যান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপর নজর রাখার জন্য তিনি সেখানে সুদীর্ঘ বারো বছর অবস্থান করেন। সেই সুযোগে রানা প্রতাপ কুম্ভলগড়সহ মেবারের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের চিতোর অধরাই থেকে যায়। আধুনিক দুঙ্গারপুরের কাছে সাভান্দে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৯৭ খ্রি.-এ মাত্র একান্ন বছর বয়সে রানা প্রতাপ সিংহ প্রয়াত হন। কর্নেল টড অননুকরণীয় ভাষায় প্রতাপ-বন্দনা করেছেন এই ভাবে, "একমাত্র আত্মবলে বলীয়ান থাকিয়া, শতাব্দীকালের এক-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া তিনি প্রতিরোধ করিতে থাকেন সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা; কখনও তিনি আসিয়া বিধ্বস্ত করিতেন সমভূমি, কখনও বা পলায়ন করিতেন পর্বত হইতে পর্বতান্তরে; তাঁহার জন্মভূমীর পার্বত্য ফলমূলই ছিল তাঁর পরিবারের ভক্ষ্যবস্তু; তাঁহার সেই বীর্যবত্তা ও প্রতিশোধগ্রহণ স্পৃহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রূপে শিশুপুত্র বীর অমরকে মানুষ করিয়া তোলেন তিনি হিংস্র পশুকুল এবং সেইরূপই হিংস্র মনুষ্যকুলের সাহচর্যে।"*

আকবরের রাজপুত নীতির তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা মোটামুটি ১৫৭৮ খ্রি.-এ। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হল রক্ষণশীল জনসমাজের সঙ্গে আকবরের বিচ্ছেদ ও তাঁর 'মহজর' ঘোষণা। এই ঘোষণা অনুসারে শরিয়তের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাকর্তার অধিকার বাদশাহ নিজের হাতে তুলে নেন। এই পরিস্থিতিতে তুরানি অভিজাতবর্গের সমর্থন না পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আকবর রাজপুতদের ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। রাজপুতরা যেন মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশীদার। এই অভিনব প্রেক্ষাপটে রাজপুত সেনাপতিদের আরও গুরুদায়িত্ব দেওয়া হতে থাকে। ১৫৮০ খ্রি. নাগাদ পূর্ব ভারতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ উলেমারাও এতে যোগ দেন। বিদ্রোহীরা আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই কাবুল অধিপতি মির্জা হাকিমকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করে। তাঁর নামে খুৎবা পাঠও করা হয়। মির্জা আজিজ কোকা ও তোডরমলকে এই বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়। উত্তর-পশ্চিমে মির্জা হাকিম পাঞ্জাব আক্রমণ করে লাহোর দুর্গ অবরোধ করেন। ভগবন্ত দাস ও সঈদ খান দুর্গরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। বিশ্বস্ত রাজপুত সেনাপতিদের নিয়ে আকবর লাহোরের উদ্দেশে রওনা হলে মির্জা হাকিম কাবুলে পশ্চাদপসরণ করেন। মান সিংহ ও রাই সিংহ সিন্ধু অতিক্রম করে মির্জার সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন। আকবর কাবুল অধিকার করলেও মির্জা হাকিমকেই সেখানকার অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় তাতে সিন্ধু অঞ্চলের দায়িত্ব মান সিংহকে দেওয়া হয়। ১৫৮১ খ্রি.-এ ভগবন্ত দাসকে প্রথমে সঈদ খানের সঙ্গে যুগ্মভাবে, পরে ১৫৮৩ খ্রি.-এ এককভাবে লাহোরের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ১৫৯০-৯১ খ্রি.-এ বিকানীররাজ রাই সিংহ এই পদে আসীন হন। তাঁর পুত্র সুরজ সিংহ গুজরাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

এইভাবে রাজপুতরা মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্রে পরিণত হয়। শুধু সামরিক নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তারা দায়িত্বশীল পদে আসীন হয়। অম্বর, যোধপুর, বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজপরিবারগুলি আকবরের পুত্রদ্বয় সেলিম ও দানিয়েলের সঙ্গেও তাদের কন্যাদের বিবাহ দেন। অতএব আকবর অনুসৃত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের রীতি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মেও অব্যাহত থাকে।

(ঙ) প্রকৃতি : দীর্ঘদিন পূর্বে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ম্যালেসন মন্তব্য করেছিলেন, শুধু শাসন করার জন্য আকবর রাজপুত রাজ্যগুলি জয় করেননি। তাঁর কাছে রাজপুতদের শান্তি ও সমৃদ্ধিই ছিল কাম্য যা তাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে ভিনসেন্ট স্মিথ ম্যালেসনের বক্তব্যকে 'অসত্য অর্থহীন' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ছিল আকবরের রাজপুত নীতির মূল ভিত্তি। এর মধ্যে কোনো নৈতিক যৌক্তিকতা খোঁজা অর্থহীন। রাজপুত জাতির মঙ্গলসাধন তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। যেসব রাজপুত নেতা তাঁকে অমান্য করেছিল তাদের তিনি কোনোরকম দয়া প্রদর্শন করেননি। ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের রাজপুত নীতির মধ্যে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। কিন্তু এটুকু বললেই যেন সব কথা বলা হয় না। আকবর রাজপুত রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি পূর্বতন তুর্কি সুলতানদের মতো সাম্রাজ্যবিস্তার ও গৌরব অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরিদের থেকে তাঁর পার্থক্য ছিল এই, যে রাজপুত জাতি মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে গেছে, তারাই মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়। তিনি রাজপুতদের বিধর্মী হিন্দু হিসাবে দেখেননি অথবা রাজনৈতিকভাবে পদানত হিসাবে অসম্মানও প্রদর্শন করেননি। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পরাজিত রাজপুত নেতাদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল সহিষ্ণু। মিত্র রাজপুত রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। অতএব আকবরের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কিছু উদারতা ও সহনশীলতার স্পর্শ ছিল।

আজ থেকে বহুবছর পূর্বে পণ্ডিত গৌরীশংকর ওঝা আকবরকে এক নীচ কূটনীতিবিদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিজাতীয় ও বিধর্মীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আকবর রাজপুতদের জাতিগত গৌরব ও রক্তের বিশুদ্ধতা অপবিত্র করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে স্বাধীনতার পূজারি এক জাতিকে আকবর তাঁর দাসে পরিণত করেন। পণ্ডিত ওঝার এই জাতীয় মন্তব্য এক বিশেষ সংস্কারপ্রসূত মনোভাবের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে এখানে অস্বীকার করা হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ভারতীয় ইতিহাসে নতুন নয়। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত আছে। তা ছাড়া বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সব রাজপুত রাজ্যের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না।

(চ) ফলাফল : আকবরের রাজপুত নীতি সাফল্য অর্জন করেছিল। *প্রথমত*, এর ফলে মোগল বাদশাহগণ প্রায় চার প্রজন্ম ধরে মধ্যযুগের ভারতের সবচেয়ে দক্ষ ও সুযোগ্য জাতির সামরিক ও প্রশাসনিক সহায়তা লাভ করেছেন। রাজপুতদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারে ও একটি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয়ত, দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতির প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে আকবর সক্ষম হন। সুদক্ষ রাজপুত নেতাদের উচ্চ সামরিক ও প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত করে রাজস্থান

থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে নিযুক্ত করা হয়। ফলে মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাব্য নেতাদের রাজস্থানের বাইরে বাস করতে পরোক্ষভাবে বাধ্য করা হয়। রাজস্থানের সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোগলবাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। এর ফলে সেখানে মোগলদের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

তৃতীয়ত, রাজপুত রাজারা বিশেষ দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে গেলে মোগলরা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে লাভবান হয়। রাজপুত রাজাদেরও এর ফলে সম্মান ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর্থিক দিক থেকেও তারা লাভবান হন। নিজের দেশের বাইরে কর্তব্যরত অবস্থায় মনসবদার হিসাবে তাঁরা অতিরিক্ত জাগীর লাভ করতেন। ভগবন্ত দাস ও মান সিংহ গুজরাতে কর্মরত থাকাকালীন সেখানে জাগীর ভোগ করেন। বিহার ও বাংলার শাসনকর্তা হিসাবেও মান সিংহ সেখানে জাগীর লাভ করেন।

চতুর্থত, রাজপুত জাতির সহযোগিতা লাভের পরোক্ষ অর্থ মোগলদের প্রতি সমগ্র হিন্দু জনসমষ্টির সমর্থন। কেননা রাজপুতগণই এক অর্থে সমগ্র হিন্দু জাতির প্রতিনিধিত্ব করত। উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ হিন্দু আকবরের শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ও এর স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করে। মোগল শাসনের ভিত্তি এই অর্থে সুলতানি শাসনের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও দৃঢ়মূল ছিল।

পঞ্চমত, সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন রাজপুত তথা হিন্দুদের অন্যান্য অহিন্দু গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে রাজকীয় প্রশাসনে অন্তর্ভুক্তির ফলে একটি মিশ্র শাসকশ্রেণির সৃষ্টি হয়। আইন-ই-আকবরীর একটি হিসাব অনুযায়ী ১৫৭৫ থেকে ১৫৯৫ খ্রি.-এর মধ্যে পাঁচশোর বেশি পদমর্যাদার মনসবদারদের মধ্যে এক-ষষ্ঠাংশ ছিল হিন্দু ও তিরিশ জন হিন্দুর মধ্যে সাতাশজন ছিল রাজপুত। আকবর সৃষ্ট অভিজাতবর্গের মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভারসাম্য বজায় থাকত। এর ফলে শুধু প্রশাসনিক সুবিধাই অর্জিত হয়নি, হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পথও সুগম হয়।